Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহনাজ আকতার

রোলঃ 227022207

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহনাজ আকতার

রোলঃ 227022207

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সবরের সুফল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাহনাজ আকতার, আইডিঃ 227022207 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সবরের সুফল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shahnaz

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

শাহনাজ আকতার

আইডিঃ 227022207

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা....................1
সবরের পরিচয়....................3
সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ....................4
সবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা....................6
আলকুরআনে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য....................7
সবর ঈমানের অর্ধেক....................9
সবর হচ্ছে নূর....................10
সবর অবলম্বন প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে উত্তম....................11
সবর ধারণকারীদের প্রতি আল্লাহর পুরস্কারের ঘোষণা....................13
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি....................15
সবর ধারণ জগতে সম্মান হওয়ার পথ....................16
সবরের বিনিময় জান্নাত....................17
সবর নিয়ে মনীষীদের উক্তি....................18
সাহাবীদের জীবনে সবর....................20
পূর্বেকার যুগের নবী-রাসুলদের জীবনে সবর....................22
রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবর....................23
নামাজে বাঁধা ও নবীজির সবর....................25
কাফেরদের নির্যাতনে নবীজির সবর....................25
বিপদাপদে ও অনাহারে সবর....................26
পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে সবর....................27
হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর সবর....................28
হযরত মুসা (আ.)-এর সবর....................29

হযরত নূহ (আ.)-এর সবর 32

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর সবর 33

খুবাইব রাদিআল্লাহু আনহুর সবর..34

আহমাদ বিন হাম্বল (রহি.)-এর সবর 37

সবর বাড়ানোর উপায় 39

উপসংহার..45

গ্রন্থপঞ্জি...47

তথ্যসূত্র 47

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ সবরকারী, সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ ও সর্বাধিক প্রশংসাকারী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ।

দুনিয়াটা দুঃখ-শোকে পরিপূর্ণ। এই দুনিয়াতে সুখের চেয়ে দুঃখের আয়োজনই বেশি। হাসির চেয়ে কান্নার উপকরণই অধিক। এজন্য পৃথিবীতে মানব জীবনের সূচনা হয় কান্না দিয়ে। পার্থিব এ জীবনে বিপদ আসবে স্বাভাবিক এবং পরিক্ষা অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী। তাই মহান আল্লাহ ধৈর্যকে মুমিনের দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, মুক্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যম বানিয়েছেন। যার ফলে সে চরম সংকটেও পথ হারায় না।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ধৈর্যশীলদের অগণিত প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গিকার করেছেন। আল্লাহ তা আলা বলেন :

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ
নিশ্চয় সবরকারীদের অগণিত প্রতিদান দেওয়া হবে।
সূরা যুমার,আয়াত: ১০

সেই সঙ্গে তাদের এই নিশ্চয়তাও প্রদান করেছেন যে, তিনি সবসময় তদের সঙ্গে থাকবেন। সুখে-দুঃখে তাদের সঙ্গ দেবেন।মহান আল্লাহ বলেন:

واصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে।
সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৬

ঈমান মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। এক. ধৈর্য। দুই. কৃতজ্ঞতা।
কাজেই যে-ব্যক্তি নিজের কল্যাণ চায় এবং প্রকৃত মুক্তি ও অনাবিল সুখ কামনা করে তার কর্তব্য হলো-এই গুণ দুটিকে নিজের মধ্যে ধারণ করা এবং পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে এর চর্চা করা।কেউ যদি এই গুণ দুটি অর্জন করতে পারে তবে কিয়ামতের দিন সে সফলকাম হবে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহি.) বলেন-
"ঈমানদারদের জীবন ক্রমাগত বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করানো হয় তাদের ঈমানকে বিশুদ্ধ ও তাদের পাপকে মোচন করানোর জন্য। কারণ ঈমানদারগণ তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ কেবল রবের সন্তুষ্টির জন্য করেন। তাই জীবনে সহ্য করা এই দুঃখ-কষ্টগুলোর জন্য তাদের পুরস্কার দেয়া রবের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।" [মাজমু'উল ফাতাওয়া:১৮/২৯১]

সত্যিকার মুমিনরা বিপদে কখনো হতাশ হন না। তারা বিশ্বাস করেন,রবের এ পরীক্ষা একদিন শেষ হবেই। হতাশার কালো মেঘ দূর করে একদিন রবই সুখ দিবেন। তাই তারা ধৈর্যধারণ করে দুঃখ-দুর্দশায় স্থির থাকেন।
আমাদের উচিত ধৈর্যের সাথে সব কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা।শত কষ্টেও আশায় বুক বাঁধা।বিশ্বাস রাখা যে,একদিন এ অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর আসবেই। দুঃখের সময় রবের কাছে প্রার্থনা করা।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-
"হে মুমিনগণ ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" সূরা বাকারা: ১৫৩

যারা বুদ্ধিমান তারা কখনোই দুঃখ-কষ্টকে দেখে বিচলিত হন না।পেরেশানও হন না।তারা ধৈর্যধারণ করেন। মহান রবের কাছে সুখের সোনালি ভোরের প্রত্যাশায় চোখ ও বুক ভিজিয়ে দোয়া করতে থাকেন।
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.
"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষের দমন-পীড়ন থেকে।"
[সহিহ বুখারি: ২৮৯৩]

দুনিয়ার লোভনীয় কোনো কিছুর মাঝেই স্বস্তি নেই।কোনো কিছুই হতাশাগ্রস্ত কে স্বস্তি জোগাতে পারেনা---শুধুমাত্র সবর ছাড়া।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবরকারী ও ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন।আমীন।

সবরের পরিচয়

ধৈর্যের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সবর'। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিরত রাখা বা আটকে রাখা। তবে ব্যবহারিক দিক থেকে শব্দটি অবিচলতা, মনকে অস্থিরতা ও অতি উদ্বেগ থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগপ্রবণতা থেকে সংযত রাখা এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও শোকাতুর সময়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কপাল ও বুক চাপড়ে বিলাপ করা থেকে রক্ষা করা-অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.

"হে নবি! আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে আহবান করে।" (সূরা কাহাফ :২৮)

অর্থাৎ হে নবি! আপনি তাদের সাথে নিজেকে আটকে রাখুন। তাদের থেকে আলাদা বা পৃথক হবেন না। বনি ইসরাইল বলেছিলো, যেমনটা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ.

"আমরা একই খাদ্যর উপর ধৈর্যধারণ করতে পারবো না।"
সূরা বাকারা:৬১

অর্থাৎ আমরা একই খাদ্যের উপর নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে পারবো না।

ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগনের মতামত:

কতক আলিম ধৈর্যকে একটি উত্তম মানবিক গুণ অথবা নৈতিক মূল্যবোধ বলে অভিহিত করেছেন,যার অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে আমরা নিজেদের খারাপ কিছু থেকে বিরত রাখি।ধৈর্য ছাড়া মানুষ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে সক্ষম নয়।

আবু উসমান বলেন, "(ধৈর্য তা) যা ব্যক্তিকে অপছন্দনীয় বিষয়সমূহের আক্রমণে অভ্যস্ত করে তোলে।" আমর ইবনু উসমান আল-মাক্কি (রহি.) বলেন, "ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা এবং তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিপদ-আপদ নীরবে শান্তমনে গ্রহণ করা।" আল-খাওয়াস (রহি.) বলেন, "ধৈর্য বলতে কুরআন- সুন্নাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরা

বোঝায়।” আরেকজন আলিমের মতে : “কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই ধৈর্য।” আর আলি ইবনু আবী তালিব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, “ধৈর্য হলো পশুর পিঠে আরোহণ করার মতো, যা থেকে তুমি ছিটকে পড়বে না।”
দুঃখ-দুর্দশার সময়গুলোতে ধৈর্যশীল থাকার অবস্থা ভালো, নাকি এমন অবস্থা ভালো যাতে ধৈর্যের কোনো প্রয়োজনই পড়ে না?

আবূ মুহাম্মাদ আল-হাবিরি (রহি.) বলেন, “ধৈর্য হচ্ছে সুদিন ও দুর্দিনকে আলাদা করে না দেখা এবং সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা।" আমি (ইবনু কায়্যিম রহি.) বলি, এটা খুবই কঠিন, আর এমনটা করতে আমাদের নিদের্শও দেওয়া হয়নি। আল্লাহ আমাদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে, আমরা সুসময় ও দুঃসময়ের মধ্যকার পার্থক্যটা অনুভব করতে পারি। আর আমরা বড়জোর চাপের সময় উদ্বিগ্ন হওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারি। ধৈর্যের মানে ভালো-মন্দ উভয় অবস্থায় একইরকম অনুভূতি নয়-এটা আমাদের আয়ত্তের বাইরে এবং তা মানবীয় প্রকৃতির মধ্যেও পড়ে না।

সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ

কুরআন মাজীদে صبر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হল, নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির ওপর অটল অবিচল রাখা। যদিও সবজায়গায় আভিধানিক অর্থের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে।

আল্লামা রাগেব আস্ফাহানী রাহ. (মৃত্যু : ৫০২ হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন’-এ صبر -এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন:

والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه.
বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। (আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ২৭৩)

সবর শব্দটির শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হলো

এক. বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ،الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।
সূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬

দুই. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা।যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মু্মিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। (তাওযীহুল কুরআন, পৃ. ১৮৫)

তিন. জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ। এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর।
সূরা বাকারা (২) : ২৫০

চার. যালেম ও অত্যাচারীদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰي مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰي اَتٰهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي الْمُرْسَلِيْن.َ

বস্তুত তোমাদের পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা তোমার কাছে তো পৌঁছেছেই। সূরা আনআম (৭) : ৩৪
এখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের কষ্টই উদ্দেশ্য হতে পারে।

সবরের গুরুত্ব ও মর্যাদা

মানব জীবনে সবর বা ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত মুমিনের জীবনে সবর এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যা মুমিনের জীবনকে সব ধরনের হতাশা এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়। আর ঈমানের পরিপূর্ণতায় সবরই হচ্ছে উভয় জাহানে কামিয়াবির অন্যতম পথ ও পন্থা। কারণ, দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে সবরের যে প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই। সূরা আল-আসরে আল্লাহ তায়া'লা অত্যন্ত চমৎকারভাবে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ, পৃথিবীতে যারা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত নয়, এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সবরকারীদের। আর ক্ষতির বিপরীতই হচ্ছে সাফল্য এবং কল্যাণ। এটা সবরকারীর জন্য সবচেয়ে বড় পাওনা তাঁর মহান রবের পক্ষ থেকে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন:
وَالْعَصْرِ.إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ.إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.ِ
কালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।' (সূরা আল আসর: ১-৩)

এই সূরা থেকে এই শিক্ষাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের নাজাতের পথ চারটি। তন্মধ্যে চতুর্থটি হলো-সবর বা ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ, মুমিনের জীবনে সবরের যে প্রয়োজনীয়তা এটাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, কোনো মানুষ যদি কেবলমাত্র সূরা আসরের তাৎপর্য, গুরুত্ব এবং শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তবে এটা তার হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ,

এই বিষয়গুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো বান্দার সাফল্যের দরজা খুলে দিতে পারে। আর সবর তার অন্যতম। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে যারাই স্মরণীয় বরণীয় হয়েছেন তারা সবাই ছিলেন এই সবর পথের পথিক।

হযরত লোকমান (আ.)- তিনি তাঁর পুত্রকে সবরের উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়া'লা হযরত লোকমান (আ.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেন এভাবে:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

'হে বৎস! তুমি নামাজ কায়েম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।' (সূরা লোকমান : ১৭)

উপরোক্ত আয়াতেও চারটি বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। যা সংকল্পের কাজ। সত্যিকার অর্থে প্রেষণা এবং সংকল্প নিয়ে কোনো কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত। লোকমান (আ.)-এর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে সেই সাফল্যের রাজপথ, যা সবরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, মানুষের জীবনে সবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তায়া'লা এই সবরকে যাবতীয় কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু এবং উৎস বলেছেন। অর্থাৎ, সবরের মাধ্যমে বান্দা যা অর্জন করতে পারে, তা অন্য কোনো মাধ্যমে পারা যায় না। বিশেষত, দ্বীনি দায়িত্ব পালনে সবরের যে প্রয়োজনীয়তা, এটা মুমিনের জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলে। এর ফলে কঠিন দুঃখ-কষ্টে থাকলেও এর প্রতিদানে আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে উচ্চতর সম্মানে ভূষিত করেন।

'হযরত আলকামা (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: সবর বা ধৈর্যধারণ হলো ঈমানের অর্ধেক।' (বায়হাকী-শুয়াবুল ঈমান)

আলকুরআনে ধৈর্যের আদেশের তাৎপর্য

এ পৃথিবী যেহেতু পরীক্ষাক্ষেত্র। তাই নানাভাবে মানুষের জীবনে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা আসবে। নানারকম বিপদাপদ আসবে। তাকে এ পরীক্ষায় ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই কঠিন বিপদাপদে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْن.َ

(সুতরাং হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য। সূরা আহকাফ (৪৬) : ৩৫

তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن.َ

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

সবর ঈমানের অর্ধেক

ধৈর্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জনে সে ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। কেননা আমল অল্প হোক কিংবা বেশি, তা আদায় করতে হলে উপযুক্ত ধৈর্যের প্রয়োজন। তাইতো এর প্রতি উৎসাহ দিয়ে অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।

ইবনে মাসঊদ রা. বলেন: ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।

বিশিষ্ট আলেমগণের অভিমত, ঈমানের অর্ধেক ধৈর্য ও বাকি অর্ধেক শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা।

ঈমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি। কথার অর্থ হলো, অন্তরের অন্তঃস্থল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করা এবং অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা।এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দু-ধরনের শক্তি থাকে। একধরনের শক্তি তাকে কল্যাণকর কাজের দিকে ধাবিত হতে সাহায্য করে; আরেকটি তাকে অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। একারণে মানুষ যা পছন্দ করে এই শক্তি তাকে সে দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে, আর যা অপছন্দ করে তা থেকে বিরত রাখে; অধিকন্তু দ্বীনের সামগ্রিক চেতনাও এটাই যে, মানুষ আল্লাহর আনুগত্য ও কল্যাণের দিকে ধাবিত হবে; আর অবাধ্যতা ও অকল্যাণ থেকে বিরত থাকবে। আর এ দুটি কাজ ধৈর্যের অন্তর্নিহিত শক্তি ব্যতিরেকে আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং সঙ্গত কারণেই বলা যায় যে, ধৈর্য দ্বীনের অর্ধেক।

যার সবর নেই তার পূর্ণ ঈমান নেই। সবরবিহীন ঈমানদার দ্বিধাগ্রস্ত ঈমানদার। এ ধরনের ঈমানদার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর এবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। সূরা হাজ্জ : **১১**

যে সবর করে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করে সেই ভাগ্যবান উল্লেখ করে ইসলামি গবেষকরা বলেন, পৃথিবীতে যারা সুন্দর জীবন গড়তে পেরেছে, তারা সবরের গুণেই তা গড়েছে। তারা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে এই সবরের বদৌলতেই। তারা দুঃসময় এলে ধৈর্য ধারণ করে আর সুসময় এলে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে। আর এভাবে তারা সবর ও শোকরের ডানায় চড়ে জান্নাতের অধিকারী হন।

সবর হচ্ছে নূর

আপনি হাদীসের দিকে তাকান। রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

الصَّبْرُ ضياء

"ধৈর্য হলো আলোকরশ্মির মতন।"
(তিরমিযি, ৩৫১৭)

সবর কিভাবে আলোকরশ্মি হতে পারে?
সবর এই জীবনের নূর হওয়ার কারণ হলো: দুনিয়ার জীবনে 'সমস্যা' দেখা দেয় কালোমেঘ হিসেবে। আপনারা সবাই এই অবস্থা সম্পর্কে জানেন। কারণ, প্রত্যেককেই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। যখন আপনারা যথাযথভাবে সবর করবেন, কালোমেঘের মাঝে 'ধৈর্য' উদিত হবে 'আলোক আভা' হিসেবে। এই সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করছি।

আল্লাহর রাসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবরকে তুলনা করেছেন আলোকরশ্মির সাথে। শুধুমাত্র দুনিয়াতেই নয়, বিচার-দিবসেও আমলের পাহাড়ের সাথে 'সবর' উপস্থিত হবে 'নূর' হিসেবে। এ বিষয়টিই নবিজি শিক্ষা দিয়ে ছিলেন এগারো বছরের এক বালককে। বালকটি ছিলেন 'ইবনু আব্বাস'। নবিজি তাঁকে বলেছিলেন, বিজয় আসে ধৈর্যের মাধ্যমে।

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ

"জেনে রাখো, বিজয় আছে ধৈর্যের সাথে। "
তিরমিযি,২৫১৬

যদি আপনার পাশে কেউ নাও থাকে, তবুও মনে রাখবেন-আল্লাহ তাআলার নাম হচ্ছে "আস-সবুর"। এটাই আপনার জন্যে যথেষ্ট। কারণ, আল্লাহ তাআলার এই সিফাত বা গুণ রয়েছে। তবে এসব গুণাবলি কিভাবে আল্লাহ তাআলার ওপর আরোপ হবে, আমরা তা জানি না। আমরা এও জানি না, আল্লাহ তাআলার সবরের ধরন কেমন। কেবল এটুকু জানি, তিনি সবর করেন। আমরা যখন বলি, আল্লাহ তাআলা 'আস-সাবুর', তিনি সবর করেন; তখন তাঁর এই গুণের সাথে মর্যাদা যোগ করে বলি। সবরের গুণ আমাদের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু সেটা কোনোভাবেই আল্লাহর তাআলার অনুরূপ নয়।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।"
সূরা আশ-শূরা : **১১**

সবর অবলম্বন প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে উত্তম

সবর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম। দুনিয়াতেই যে নেয়ামত লাভ হয়।
সবর বা ধৈর্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নেয়ামতের ঘোষণা করেছেন।
আবার কারো অন্যায়ের বিচার তথা প্রতিশোধ নেয়ার বিধান দিয়েছে ইসলাম।কেউ কারো প্রতি কোনো অন্যায় করলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ। তবে প্রতিশোধ নেয়ার মানদণ্ড নির্ধারণ করা আছে।কেউ যদি প্রতিশোধ গ্রহণ না করে সবর অবলম্বন করে তবে তা উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন- 'আর যদি কাউকে তোমরা শাস্তি দাও, তবে ততখনি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।
আর যদি সবর করো তাহলে তা তার জন্যেই উত্তম'। (সুরা নহল : আয়াত ১২৬)
এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রতিশোধের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি সবর তথা ধৈর্যধারণ করার কথাও উল্লেখ করেছেন। ইসলামে উভয়টি জায়েয এবং সবর অবলম্বন প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে উত্তম।

প্রথমত প্রতিশোধ গ্রহণ: আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীদেরকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু শর্ত হলো- প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না।

যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশি হতে পারবে না। হাদিসে এসেছে-

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদি এক মেয়েকে দুই পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করে, মৃত্যুর আগে সে মেয়ে এক ইয়াহুদির প্রতি ইঙ্গিত করে। সেই ইয়াহুদিকে নিয়ে আসা হলে সে তা (হত্যার কথা) স্বীকার করে। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে ইয়াহুদিকে দুই পাথরের মাঝখানে বেঁধে হত্যা করার আদেশ করেন। (বুখারি, মুসলিম)

দ্বিতীয়ত সবরের পরামর্শ: আয়াতের শেষাংশে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণ করার অধিকার আছে, কিন্তু সবর অবলম্বন করা উত্তম। উহুদের যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবির শাহাদতবরণ এবং হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার পর তার লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারুণভাবে মর্মাহত হলেন।

সাহাবায়ে কেরাম (আনসারগণ) বললেন, আমরা যদি তাদের ওপর জয়লাভ করি, তবে তাদেরকে দেখিয়ে দেব। তারপর মক্কা বিজয়ের দিন আসল। তখন আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন-

যদি শাস্তি দিতে চাও তবে ততটুকুই দেবে, যতটুকু তোমরা শাস্তি ভোগ করেছ। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তবে তা ধৈর্যশীলদের জন্য অনেক উত্তম (কল্যাণকর)। '

তখন এক লোক বলল, আজকের পরে কুরাইশদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, '৪ জন ব্যতিত আর সবাইকে ছেড়ে দাও। (মুসতাদরেকে হাকেম, তিরমিজি, নাসাঈ)

ইসলামে প্রতিশোধ গ্রহণ জায়েজ তবে সবরে রয়েছে সর্বোত্তম কল্যাণ। তবে প্রতিশোধের ক্ষেত্রে অবশ্যই জুলুমের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এটাই ইসলামের চূড়ান্ত ঘোষণা।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবর করেছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় নাজিল হয়েছিল।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর উচিত জুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ বা শাস্তি প্রদানের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা জরুরি। কোনোভাবেই যেন প্রতিশোধ জুলুমের মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। আর মাজলুম ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণের চেয়ে সবরে রয়েছে সর্বোত্তম কল্যাণ।

সবর ধারণকারীদের প্রতি আল্লাহর পুরস্কারের ঘোষণা

ধৈর্যশীলতা অর্জন করা যত কঠিন, এর পুরস্কারও তত বড়। মানুষের জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতি আসাটা স্বাভাবিক। যারা তখন আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ তাদের অগণিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'বলো! হে আমার মুমিন বান্দারা, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর জমিন প্রশস্ত,কেবল ধৈর্যশীলদেরই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।' (সুরা : আজ-জুমার, আয়াত : ১০)

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن.َ

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব। (সূরা নাহল : ৯৬)

আরো ইরশাদ হয়েছে

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْن.َ

এরূপ ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিগুণ। কেননা তারা সবর অবলম্বন করেছে, তারা মন্দকে প্রতিহত করে ভালোর দ্বারা এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। (সূরা কাসাস : ৫৪)

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন কোনো মুমিন বিপদগ্রস্ত হয় আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপ মোচন করেন, যদি না সে অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়ায়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৬৪০)

আলোচ্য হাদিসে মুমিন বান্দাদের বিপদগ্রস্ত হলে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো মুমিন বিপদগ্রস্ত হওয়ার পর মানুষের কাছে অভিযোগ-অনুযোগ এবং ভাগ্যকে দোষারোপ না করে ধৈর্যধারণ করলে বিনিময়ে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন।

কোরআনে বর্ণিত আটটি আসমানি পুরস্কারের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. আল্লাহকে কাছে পাওয়া যায় : ধৈর্যধারণকারীর সঙ্গে আল্লাহ থাকেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৫৩)
২. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘এবং আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীকে ভালোবাসেন।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৬)
৩. ধৈর্যধারণকারীর জন্য অপেক্ষা করে সুসংবাদ : যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, ‘এবং আপনি ধৈর্যধারণকারীদের সুসংবাদ দিন।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৫৫)
৪. ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম প্রতিদান : আল্লাহ ধৈর্যের পুরস্কার ঘোষণা করে বলেছেন, ‘এবং যারা ধৈর্যধারণ করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে তারা যে কাজ করে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেব।’ (সুরা : নাহল, আয়াত : ৯৬)
৫. ধৈর্যশীলদের আল্লাহ সাহায্য করেন : পবিত্র কোরআনে ধৈর্যশীলদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, ‘হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১২৫)

৬. ধৈর্যশীলদের প্রতি ফেরেশতাদের সালাম : ধৈর্যশীল বান্দা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, জান্নাতের ফেরেশতারা তাদের প্রতি সালাম পাঠ করবে। আল্লাহ বলেন, ‘এবং ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হবে এবং বলবে তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কতই না ভালো পরিণাম (তোমাদের)।’ (সুরা : ইনসান, আয়াত : ১২)

৭. আল্লাহ তাদের রক্ষক হয়ে যান : আল্লাহ নিজেই ধৈর্যশীলদের রক্ষা করেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো তবে তাদের কোনো কৌশল তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১২০)

৮. নেতৃত্ব লাভ : শায়খ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ‘ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্জিত হয়। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন, ‘আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাসী।’ (মাদারিজুস সালিকিন : ২/১৫৪; সূরা : সিজদা, আয়াত : ২৪)

সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

ধৈর্যশীলদের আল্লাহ অসংখ্য সাহায্য করবেন, তাই তো আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যধারণের মাধ্যমে তার থেকে সাহায্য কামনা করতে আদেশ করেছেন।

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.ِ

"তোমরা নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য কামনা কর।"
(সূরা বাকারা : ৪৫)

সুতরাং যে তার উপর নিপতিত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করবে না, তার জন্য প্রিয়তম রবের থেকে সাহায্যও আসবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি যা অপছন্দ করো তাতে ধৈর্যধারণের বেলায় তোমার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। আর জেনে রাখো, রবের সাহায্য কেবল ধৈর্যধারণকারীদের সাথেই। (মুসনাদ আহমাদ :২৮০০)

ইমানের পাখি সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যধারণ করার কারণে

আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِين.َ

"অবশ্য তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং বিরত থাকো আর কাফেররা যদি তোমাদের উপর চড়াও হয় তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।
সূরা আলে-ইমরান : **১২৫**

বনি ইসরাইলকে ফেরআউনের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন একমাত্র ধৈর্যের কারণে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُون.َ

"আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে আমি এ ভূ- খন্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, যেখানে আমার বরকত সন্নিহিত রয়েছে। আর বনি ইসরাইলের উপর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ। একমাত্র তাদের ধৈর্যধারণের কারণে। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সব কিছু যা তৈরী করেছিলো ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করে দিয়েছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছে।
সূরা আল-আরাফ : ১৩৭

ইমাম শাফেঈ (রহি.) বলেন, ধৈর্য হলো স্থিরতা আর এর ফলাফল হলো বিজয়।
তারিখে দিমাশক: ৫১/৪০৮

সবর ধারণ জগতে সম্মান হওয়ার পথ

ধৈর্যই মানুষকে এই জগত সংসারে সম্মানী বানিয়ে দেয়, ধৈর্যশীল কখনো কারো সামনে নিজের মাথা নত করে না। ধৈর্যের ফলে সে অন্য কারো জিনিসের প্রতি লোভী হয় না বরং নিজের যা থাকে তার উপরই তুষ্ট হয় এবং ধৈর্যধারণ করে।

ইয়ারমুক যুদ্ধে আবুল আওয়ার মুসলমানদের ডেকে বললেন-হে কুরাইশ গোত্র! তোমরা তোমাদের প্রতিদান ও ধৈর্যের অংশকে গ্রহণ করো। কেননা ধৈর্যই হলো দুনিয়ায় বড় সম্মান ও আখেরাতে রহমত ও ফজিলত। তাই ধৈর্যধারণ করো, অধৈর্য হয়ো না। সালিম কত সুন্দর করে কবিতা আবৃত্তি করেছেন-

গলেতে আমি পরেছি সবরে জামিলের মালা, প্রভু আমাকে রেখেছেন হেফাজত সব বখিলদের বালা।

সবরের বিনিময় জান্নাত

এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় যদি কোনো ব্যক্তির বন্ধুর প্রাণপাখি উড়ে যায় না ফেরার দেশে, আর সে তার বন্ধুর বিরহে ধৈর্যধারণ করে ও সওয়াবের কামনা করে তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে রাখেন।

আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তোমার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হবে, সুতরাং তাতে তোমার ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাহলেই তুমি পাবে জান্নাতের সুখ, পাবে আখেরাতের হাজারো নিয়ামত।
পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

"তোমাদের কি এ ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ তোমাদের উপর (সেসব দুর্দশা) আপতিত হবে না, যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর আপতিত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। তখন তারা এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যাতে নবি ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিলো তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে-কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শোনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"
সূরা বাকারা :২১৪

খুবই কুৎসিত এবং ছোট আকৃতির লোক ছিলেন তাবেঈ ইমরান বিন হাত্বান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিল খুবই সুন্দরী। একদিন ইমরান বিন হাত্বান বাড়ি এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রী নতুন পোশাকে অপরূপা হয়ে আছে। দেখতেও চমৎকার সুন্দর লাগছিল তাকে। স্ত্রীর দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাতেই তার স্ত্রী বলে উঠলো- 'ইন শা আল্লাহ; আমরা উভয়ে জান্নাতি হবো'; কিন্তু কেন? এমন কি ঘটলো যে তিনি এমনটি বললেন?

সঙ্গে সঙ্গেই ইমরান স্ত্রীর কথা শুনে বললেন, 'তা কি করে?
এবার স্ত্রী বললো- একজন সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে তুমি অত্যন্ত শোকর-গুজার আছ। আর আমি তোমার মতো কুৎসিত স্বামীকে নিয়ে ধৈর্য ধরেছি। আর আল্লাহ তাআলা তো শোকর-গুজার ও সবরকারীদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন।
হ্যাঁ, তাইতো; তাবেঈ ইমরান বিন হাত্বান-এর স্ত্রী দুইটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের বিনিময়ের কথাই বলেছেন। যে আমল দুইটির বিনিময় শুধুই জান্নাত। হাদিসে পাকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ঘোষণা করেছেন। তা হলো-

সবরকারীর জন্য জান্নাত

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে বনি আদম! যদি তুমি ধৈর্যধারণ করো ও প্রথম দুঃখের সময় অধৈর্য না হয়ে তাতে সাওয়াবের আশা করো; তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ছাড়া কোনো প্রতিদানে সন্তুষ্ট হবো না।' (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

শোকরকারীর জন্য জান্নাত

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে শোকর-গুজার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। শোকর-গুজার করলে পুরস্কার বাড়িয়ে দেওয়ার কথাও বলেছেন। আবার অকৃতজ্ঞ হতে নিষেধ করেছেন। যারা অকৃতজ্ঞ হবে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, তবে তোমাদেরকে আরও (পুরস্কার) বাড়িয়ে দেব আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।' (সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৭)

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, তাবেঈ হযরত ইমরান বিন হাত্বান-এর স্ত্রীর মতো শোকর-গুজার ও সবরকারী হওয়া। তিনি তো কোরআন-সুন্নাহর ঘোষণায় পেয়েছেন জান্নাতের অঙ্গীকার।

সবর নিয়ে মনীষীদের উক্তি

একটি মানুষের যতগুলো মানবিক গুণাবলী আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো গুণ হলো ধৈর্য । এমনকি সফল ব্যাক্তিদের মতে, সফলতার মূল মন্ত্র হলো এই ধৈর্য । ধৈর্য ছাড়া কোন কিছুই অর্জন করা সম্ভব না ।

১। "ধৈর্য এমন একটি গাছ, যার সারা গায়ে কাটা কিন্তু ফল অতি সুস্বাদু"– আল হাদিস

২। "মোমবাতি হওয়া সহজ কাজ নয় । আলো দেয়ার জন্য আগে নিজেকেই জ্বলতে হয়" ।
— জালালউদ্দিন রুমি

৩। ধৈর্য বা সবর হচ্ছে অন্তর তাকদীরের প্রতি রাগান্বিত হয় না এবং জবানও কোনো অভিযোগ করে না ।
— ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রঃ)

৪। ধৈর্যশীল রা শান্তিতে থাকে কেননা তারা জানে যে আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিবেন ।
— মাওলানা তারিক জামিল দাঃ বাঃ

৫। সুন্দর বিদায় হলো ক্ষতি না করে বিদায় নেয়া, সুন্দর ক্ষমা হলো বকা না দিয়ে ক্ষমা করা, সুন্দর ধৈর্য হলো অভিযোগ না রেখে ধৈর্ষ্ধারণ করা।
– ইমাম ইবনে তাইমিয়া

৬।"ধৈর্য, অধ্যাবসায় আর পরিশ্রম, এই তিনটি এক হলে সাফল্যকে আর থামানো যায় না"
– নেপোলিয়ন হিল

৭।"ধৈর্য ধারণ করো। সহজ হওয়ার আগে সবকিছুই কঠিন মনে হয়"
– শেখ সাদী (রহ:)
৮।সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সেবকরা কখনও ধৈর্য হারায় না, কারণ তারা জানে নতুন চাঁদের পূর্ণিমা পর্যন্ত যেতে সময় লাগে।
–জালালউদ্দিন রুমি
৯।আমাদের জীবনের সবচাইতে স্বাস্থ্যকর উপাদান হচ্ছে সবর (ধৈর্য)।
–হযরত উমর (রা.)
১০।রেগে যাবার সময়ের এক মূহুর্তের ধৈর্য রক্ষা করে পরবর্তী সময়ের হাজার মূহুর্তের অনুশোচনা থেকে।
–হযরত আলী (রাঃ)

১১।ধৈর্য হলো সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত।
–বিল গেটস

১২।ধৈর্য একটি অসাধারণ মানসিক ক্ষমতা, এবং আমি এখনও এটা শিখছি।
–ইলন মাস্ক
১৩।আমি যদি মানুষের জন্য কিছু করে থাকি, তবে সেটা সম্ভব হয়েছে আমার ধৈর্য ধরে চিন্তা করার ক্ষমতার কারণে।

- Isaac Newton

১৪।ধৈর্য হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান যোদ্ধা ।

— লিও টলস্টয়

১৫। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু না কিছু দিয়ে পরীক্ষায় ফেলবোই: মাঝে মধ্যে তোমাদেরকে বিপদের আতঙ্ক, ক্ষুধার কষ্ট দিয়ে, সম্পদ, জীবন, পণ্য-ফল-ফসল হারানোর মধ্য দিয়ে। আর যারা কষ্টের মধ্যেও ধৈর্য-নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করে, তাদেরকে সুখবর দাও।

– [আল-বাক্বারাহ ১৫৫]

১৬। দুশ্চিন্তা আপনার সুখ চুরি করে আর আপনাকে কোনো কাজ করতে দেয় না, তাই দুশ্চিন্তা বন্ধ করুন, আল্লাহর ইবাদত শুরু করুন।

ড. বিলাল ফিলিপস

সাহাবীদের জীবনে সবর

রাসুল (সা.)-এর সাহাবীদের জীবনেও পাওয়া যায় সবরের অসংখ্য উজ্জ্বল নমুনা। মূলত তাঁরা রাসুল (সা.)-এর পর যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁদের মতো মানুষ আর পৃথিবীতে আসবে না। এজন্য তাঁদের জীবনাচরণও মুমিনের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। এজন্য তাঁদের জীবনে ঘটিত ও প্রভাবিত সবর বা ধৈর্য সম্পর্কে অবগত হওয়া একান্ত কর্তব্য। কারণ, দ্বীনের জন্য তাঁরা যে কষ্ট-সংগ্রাম এবং ত্যাগ করেছেন, তা তুলনাহীন। তাঁদের সে অবদানকে কোনোভাবেই মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তাঁদের উত্তম চরিত্র-আখলাক এবং তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এজন্যই তাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সন্তুষ্টি অর্জন করতে গিয়ে তাঁদেরকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। দশজন সাহাবী আবার দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। তাঁরাও ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সবরকারী। নিম্নে কয়েকজনের জীবনে সবর সংক্রান্ত বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো-

একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হেরেম শরীফে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে কাফিররা তাকে এমনভাবে নির্যাতন করেছিলো, যার কারণে তিনি সারাদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। এই অবস্থা দেখে তাঁর বংশের লোকেরা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলো। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হননি। বরং সবর এখতিয়ার করেন।

হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন উবাই ইবনে খালফের গোলাম। উবাই ইবনে খালফ হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্যাতন করার জন্য তার পালিত গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিয়েছিলো। এই গুণ্ডারা একদিন হযরত বেলাল (রা.)-এর পেটের উপরে বা পিঠের উপরে পাথর রেখে গলায় রশি বেঁধে সমগ্র এলাকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়েছিলো। আর তারা বলেছিলো, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম ত্যাগ করে আমাদের ধর্মে ফিরে এসো, তাহলে তোমাকে শাস্তি থেকে মুক্তিদান করা হবে। এর জবাবে হযরত বেলাল (রা.) বলেছিলেন, আহাদ-আহাদ অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া আমি কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবো না। হযরত বেলাল (রা.) এদের শাস্তির বদলা গ্রহণ করেননি। এখানে কাফেরদের অত্যাচারের মোকাবেলায় তিনি সবরকেই প্রাধান্য দেন।

হযরত ইয়াসির (রা.) এবং তাঁর বিবি সুমাইয়া (রা.)-কে কাফিরদের কঠিন শাস্তি ভোগ করিয়ে করুণভাবে শাহাদতবরণ করতে বাধ্য করেছিলো। হযরত ইয়াসির (রা.)-কে কাফিররা বারবার বলেছিলো- ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দেন। তিনি তাদের কথায় সাড়া দেননি। যার কারণে তাঁকে শাস্তিস্বরূপ দুই হাতের সাথে দুটি উট এবং দুই পায়ের সাথে দুটি উট বেঁধে হজরত খাব্বাব (রা.) সহ চারটি উটকে ছেড়ে দিয়েছিলো। চারটি উট চারদিকে তাঁকে টেনে নিয়ে চার টুকরো করেছিলো, যার কারণে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেছিলেন। হযরত ইয়াসির (রা.)-এর স্ত্রী সুমাইয়া (রা.)-এর লজ্জাস্থানে তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করা হয়েছিলো।

তাঁদের সন্তান হযরত আম্মার (রা.)-কে শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো। তিনি তাদের শাস্তি সহ্য করতে না পেরে কুফরী কালাম বলে ফেলেছিলেন। এর পরে আম্মার (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে তার কুফরী কথা বলার বিষয়টি জানালেন। এর উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, তুমি তোমার প্রাণের ভয়ে এই কাজ করেছো, যার কারণে আল্লাহ তায়া'লা তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। এখানেও দেখা যায়, তাঁরা সবরকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যার ফলে আল্লাহ তাঁদেরকে সেই সম্মানে ভূষিত করেছেন, যা তাঁদের প্রাপ্য ছিল।

জিহাদের ময়দানেও সাহাবীরা সবরকে গুরুত্ব দিতেন। এমনকি তাবুকের যুদ্ধের সময়েও মুসলমানরা ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেয়েছেন। রেশন হিসেবে প্রতি দুজন সাহাবীকে একটি করে

খেজুর দেওয়া হতো। তারা একটি খেজুরকে ভাগ করে অথবা খেজুর পানিতে ভিজিয়ে খেজুর ভিজানো পানি পান করতেন। এখানেও তাঁদের মধ্যকার সবরের বিষয়টিও প্রাধান্য দেয়।

13

পূর্বেকার যুগের নবী-রাসুলদের জীবনে সবর

মানবজাতি যখনই শিরক্, কুফরের মতো পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখনই আল্লাহ তায়া'লা তাদের হেদায়াতের জন্য নবী-রাসুল পাঠান। এভাবেই আল্লাহ তায়া'লা পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসুলকে পাঠিয়েছেন। তারা মানুষকে আহবান জানিয়েছেন এক আল্লাহর দিকে। মূলত আল্লাহকে একমাত্র রব বা উপাস্য হিসেবে স্বীকার করা এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু শরীক করা থেকে নিষেধ করেন। পাশাপাশি সব ধরনের পাপাচার ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য আহবান করেন। মূলত আল্লাহ তায়া'লা তাঁর দ্বীনের কাজ করার জন্য নবী ও রাসুলগণের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। নবী ও রাসুলগণের মধ্যে নবীগণের সংখ্যা বেশি ছিলো। আর রাসুলের সংখ্যা খুবই কম ছিলো। আল্লাহ তায়া'লার ঘোষণা ছিলো যে, এই রাসুলগণের মধ্যে কাউকে কেউ হত্যা করতে পারবে না। যার কারণে অনেক ষড়যন্ত্র করার পরেও কোনো রাসুলকে কেউ হত্যা করতে পারেনি, আল্লাহ তায়া'লা সকল রাসুলকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু যুগে যুগে নবী-রাসুলদেরকে অনেক জাতিই মেনে নেয়নি। তাঁদের উপর ঈমান আনেনি। বরং বিপরীতে তারা তাঁদের উপর চালিয়েছে অকথ্য জুলুম নির্যাতন ও নিষ্পেষণ। শুধু তাই নয়, এইসব পাপাচারীরা অসংখ্য অগণিত নবীকে হত্যা করেছে।

আল্লাহ তায়া'লা এ সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

'নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে আর ওইসব লোককে হত্যা করে যারা ইনসাফের আদেশ করে। তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।'

(সূরা আলে-ইমরান: ২১)

ইমাম কুরতুবী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, বনী ইসরাঈলের গোত্রের লোকেরা একদিকে সৌভাগ্যবান এবং অপরদিকে দুর্ভাগ্যবান। সৌভাগ্যবান এই কারণে যে, তাদের গোত্রে আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে হাজার হাজার নবী-রাসুল এসেছিলেন। আর দুর্ভাগ্য বলার কারণ হলো, তারা শত শত নবী রাসুলকে হত্যা করেছে। একদিন সকালে এক ঘণ্টার ভেতরে বনী ইসরাঈলের লোকেরা ৪৩ জন নবীকে হত্যা করেছিলো। তাঁদেরকে হত্যা করার পর তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের পথ অনুসরণ করলেন। পথহারাদের কাছে দিলেন দ্বীনের দাওয়াত। কিন্তু তারা তো মানলোই না বরং বরং হত্যা খেলায় মেতে উঠলো। এভাবে বিপদগামীরা বিকাল বেলা তাঁদের ১১২ জনকে হত্যা করেছিল।

এই তাফসীর থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ববর্তী লোকেরাও আল্লাহ তায়া'লার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। যুগে যুগে যারা আল্লাহ তায়া'লার দ্বীনের কাজ করেছে, তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে এবং অনেককে হত্যা করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন

'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর অত্যাচার ও নির্যাতন করা হয়েছে আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর। এরপরে নেককার লোকদের উপর এবং এর পরে ইসলামের জন্য যে যত বেশি নিবেদিতপ্রাণ তার উপর তার আমল অনুযায়ী।' (তাবারানী)

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবর

মানবজাতির হেদয়াতের জন্য আল্লাহ তায়া'লা যুগে যুগে অসংখ্য নবী- রাসুল পাঠিয়েছেন।তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন-আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ (সা.)। আল্লাহর দ্বীনের কালেমাকে বুলন্দ ও এ দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার নিমিত্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ ভূমিকা ও অংশ রয়েছে।আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তা তিনি সঠিকভাবে ব্যয় করেছিলেন।
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন :
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ময়দান ব্যতীত তাঁর হাত দিয়ে কাউকে মারেননি এমনকি তার স্ত্রী ও খাদেমকেও না।

মুসলিম, হাদিস: ২৩২৮

তিনি একাই কুরাইশ ও তাদের নেতাদের দাওয়াত দেয়া ও তাদের সাথে সত্যের আন্দোলনে মুখোমুখি হয়ে এ দ্বীন ইসলাম বিজয় লাভ করা অবধি টিকে থাকার পরও তিনি কখনো বলেননি যে, আমার সাহায্যে কেউ আসেনি অথবা সকল জাতির লোক আমার বিরোধী আমি একা। বরং তিনি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে মহা বীরত্বের সাথে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে গেছেন এবং লোকদেরকে উৎসাহ দান করেছেন এবং তাদেরকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠা থাকার জন্য আহ্বান করা সত্ত্বেও লোকেরা দূরে সরে যাওয়ার পরও তিনি স্থির থেকেছেন এসকল আদর্শই প্রমাণ করে তাঁর সাহসীকতা ও ধৈর্য।

মহানবী (সা.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। তিনি পৃথিবীতে আগমনের আগে তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে অনাথত্বের দুঃখগুকষ্টের ওপর তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। মাত্র ৬ বছর বয়স হওয়ার পর মা আমিনা এ পৃথিবী হতে চিরবিদায় নেন। ফলে মায়ের আদর হতে বঞ্চিত অবস্থায় অসহায়ভাবে ধৈর্যধারণ করে জীবনযাপন করতে হয়। আট বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিব পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। দাদার আদর হতে বঞ্চিত হয়েও তিনি ধৈর্যধারণ করেন। এরপর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে দুঃখ কষ্টে তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। ২৫ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবে তেমন কোনো শুভাকাক্ষী না থাকা অবস্থায়ই তার জীবনের ৪০টি বসন্ত পেরিয়ে যায়। এরপর ৪০ বছর বয়সে যখন নবুওয়তপ্রাপ্ত হন, তখন দ্বীন ইসলামের প্রচারে নানা বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। সব বাঁধা উপেক্ষা করে তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন।কুরাইশের লোকেরা তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে থাকে ও নানা বিদ্রুপে জর্জরিত করতে থাকে। মহানবী (সা.) এসব কিছুর ওপর ধৈর্যধারণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। লোকরা আশানুরূপভাবে ঈমান না আনার কারণে তিনি পরিতাপ করতে থাকেন। লোকদের ঈমান না আনার বিষয়টি তাকে কষ্ট দিতে থাকে। তিনি পরিতাপ ও আফসোস করার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন,
‘যদি তারা এ বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পেছনে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ শেষ করে ফেলবেন।’
(সুরা কাহফ : ৬)।

নামাজে বাঁধা ও নবীজির সবর:

মহানবী (সা.)-এর জন্য দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এ পথে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকে বহু কণ্টকাময় পথ পাড়ি দিতে হয়েছে; কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিজের পরিবার-পরিজন ও গোত্রসহ আবু তালিবের ঘাঁটিতে ৩ বছরের বন্দি জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তিনি থেমে যাননি। সর্বাবস্থায় দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন; আপন লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার রাসুল (সা.) সেজদারত ছিলেন। তার আশপাশে কুরাইশের মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় উকবা ইবনে আবু মুআইত উটের ভুঁড়ি এনে মহানবী (সা.)-এর পিঠে ফেলে দিল। ফলে তিনি তার মাথা তুলতে পারলেন না। অবশেষে ফাতেমা (রা.) এসে তার পিঠ হতে তা সরিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে, তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। এরপর রাসুল (সা.) বললেন, 'হে আল্লাহ! কুরাইশদের এ দলের বিচার আপনার ওপর ন্যাস্ত করলাম। হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহেল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবিআ, শাইবা ইবনে রবিআ, উকবা ইবনে আবু মুআইত ও উমাইয়া ইবনে খালফকে শাস্তি দিন।'
ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া তাদের সবাইকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়। কেননা, সে ছিল মোটা দেহের। যখন তার লাশ টানা হচ্ছিল, তখন কূপে নিক্ষেপ করার আগেই তার জোড়াগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' (বুখারি : ৩১৮৫)।

কাফেরদের নির্যাতনে নবীজির সবর

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথে কুরাইশের লোকেরা মহানবী (সা.)-এর ওপর অত্যন্ত অসভ্য, বর্বর ও পাশবিক আচরণ করত। কিন্তু রাসুল (সা.) এ ধরার বুকে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষে সব কষ্ট সহ্য করে নিতেন। অম্লান বদনে বরদাশত করতেন কাফের বে-দ্বীনের অন্যায়-অত্যাচার।
উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কার মুশরিকরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন আচরণ কী করেছিল? তিনি বললেন, আমি উকবা ইবনে আবু মুআইতকে দেখেছি, সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এলো, যখন তিনি নামাজ আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে রাসুল (সা.)-এর গলায় জড়িয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। আবু বকর (রা.) এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা

কি এমন লোককে মেরে ফেলতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার প্রতিপালক! যিনি তার দাবির স্বপক্ষে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?' (বুখারি : ৩৬৭৮)।

বিপদাপদে ও অনাহারে সবর

পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল এসেছেন, সবাইকেই বিভিন্ন বালা-মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ, যুগে যুগে একত্ববাদের অনুসারী খুব কম লোকই হয়েছে। হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় সব সময় সত্য ও মিথ্যার লড়াই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হকের বিরোধী লোক বেশি থাকার কারণে সত্যের ধারক-বাহকদের ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাকেও দ্বীনের পথে বহু কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। করতে হয়েছে ধৈর্যধারণ।
সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! কোন মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয়?' তিনি বললেন, 'নবীদের। এরপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের, তারপর তাদের পরবর্তীদের। বান্দাকে তার দ্বীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দ্বীনদারিতে অবিচল থাকে, তবে তার পরীক্ষাও হয় কঠিন। আর যদি সে তার দ্বীনদারিতে নমনীয় হয়, তবে তার পরীক্ষাও সে অনুযায়ী হয়। এরপর বান্দা অহরহ বিপদাপদে পরিবেষ্টিত থাকে। শেষে সে পৃথিবীর বুকে গোনাহমুক্ত হয়ে পবিত্র অবস্থায় বিচরণ করে।'
(সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০২৩)।

রাসুল (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ফলে তার পরীক্ষা হয়েছিল কঠিন থেকে কঠিনতর। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমাকে আল্লাহর পথে যেভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকে সেভাবে দেখানো হয়নি। আমাকে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশে যেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে, আর কোনো ব্যক্তিকে সেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়নি। আমার ওপর দিয়ে ত্রিশটি দিনরাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বেলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বেলালের সম্বল। তা ছাড়া এতটুকু আহারও ছিল না, যা কোনো প্রাণধারী প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।' (তিরমিজি : ২৪৭২)।

পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে সবর

মহানবী (সা.) তার আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছেন। খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তিনি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও কাতর হয়ে পড়েন। তিনি এতটাই ভারাক্রান্ত হন যে, তার মৃত্যুর বছরকে 'শোকের বছর' বলে নামকরণ করেন। যয়নাব (রা.)-এর এক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে মহানবী (সা.) হা-হুতাশ না করে ধৈর্যধারণ করেন ও নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকেন। ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জনৈক কন্যা (যয়নাব) নবী (সা.)-এর কাছে এ বলে লোক পাঠালেন, 'আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের কাছে আসুন।' তিনি বলে পাঠালেন, '(তাকে) সালাম দেবে ও বলবে, আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু তিনি নিয়ে যান। আর তাঁরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং পুণ্যের অপেক্ষায় থাকে।' তখন তিনি তার কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে সাদ ইবনে উবাদা, মুআজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-সহ আরও কয়েকজন সাহাবি ছিলেন। তখন শিশুটিকে রাসুল (সা.)-এর কাছে তুলে দেয়া হলো। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার নিঃশ্বাসে মশকের মতো শব্দ হচ্ছিল! আর নবীজি (সা.)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সাদ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এ কি?' তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।' (বুখারি : ১২৮৪)।

মহানবী (সা.)-এর ঔরসজাত সন্তান ইবরাহিম (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তখনও তিনি কান্নাকটি ও বিলাপ না করে ধৈর্যধারণ করেন। অবশ্য দয়া ও করুণার অশ্রু তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট।' আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে আবু সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন নবী-তনয় ইবরাহিম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় বাবা। রাসুল (সা.) ইবরাহিম (রা.)-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আরেকবার) আমরা তার (আবু সায়ফের) বাড়ি গেলাম। তখন ইবরাহিম (রা.) মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে রাসুল (সা.)-এর উভয় চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও কাঁদছেন?' রাসুল (সা.) বললেন, 'অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি, যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত।' (বুখারি : ১৩০৩)।

মহানবী সা. তায়েফবাসীকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে মহানবী সা. এর উপর নির্যাতন চালাতে উদ্যত হয়। এমনকি প্রস্তরাঘাতে তাঁর শরীর মোবারক রক্তাক্ত করে ফেলে। তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। এহেন দু:খ ও বেদনার মুহূর্তেও তিনি তাদের জন্য বদদো'য়া করেননি। যেহেতু তিনি ছিলেন 'রহমাতুল্লিল আলামীন' বা সারাজগতের রহমত স্বরূপ। বরং তিনি বললেন- 'আমি ওদের ধ্বংসের জন্য দোয়া কিরূপে করবো ? ওরা ইসলাম গ্রহণ না করলেও আশা করা যায় যে, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা অবশ্যই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।' 'সহীহ মুসলিম, সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭'

হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর সবর

আল্লাহ তায়া'লার যত বেশি মায়ার বান্দা রয়েছেন, তাঁদের জন্য পরীক্ষাও তত বেশি রয়েছে। আর পৃথিবীতে আম্বিয়ায়ে কেরামই ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে মায়ার বান্দা। এক্ষেত্রে আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের উদাহরণস্বরূপ হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর কথা বলা যায়। ইবরাহিম (আ.) ছিলেন খলিলুল্লাহ তথা আল্লাহর বন্ধু। তাই তো তাঁকে বড় ধরনের পরীক্ষার মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাকে প্রথমে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে এবং পরে নিজের সন্তান কুরবানী করার দ্বারা আল্লাহ তায়া'লা তাকে পরীক্ষা করেছেন। হজরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহ তায়া'লার সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তায়া'লার দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইরাক দেশে প্রেরণ করা হয়েছিলো। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া। কিন্তু এর বিনিময়ে সেই দেশের জনগণ এবং সরকারের পক্ষ থেকে কি প্রতিদান দেওয়া হয়েছিলো, সে সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে:

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
'তারা বললো, তাকে পুড়িয়ে মারো আর তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো-যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।' (সূরা আল-আম্বিয়া : ৬৮)

ইবরাহিম (আ.)-কে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের কথা মতো অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করা হলো। এর পরে হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। কিন্তু ইবরাহিম (আ.) সামান্যতমও বিচলিত হননি। আল্লাহর ওপর ভরসা করেছিলেন। সবর করে তাঁর রবের সাহায্য কামনা করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তায়া'লা আগুনকে ইবরাহিম (আ.)-এর জন্য ফুলের বাগিচা বানিয়ে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তায়া'লা আগুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
'আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আমি তাদেরকেই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাড়লাম।' (সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৯-৭০)

শেষ পর্যন্ত এই আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেলো এবং ইবরাহিম (আ.) এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। এর পরে ইরাকের লোকেরা হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলো। ইবরাহিম (আ.) দেশবাসীকে বলে গেলেন (কুরআনুল কারিমের ভাষায়):

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ
'সে বললো, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সঠিক পথ দেখাবেন।' (সূরা আস-সাফফাত: ৯৯)
এর পরে হযরত ইবরাহিম (আ.) মিশর ও ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশে আল্লাহ তায়া'লার দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর জীবনে ঘটেছে অসংখ্য ঘটনা। যেগুলোর মধ্যে মিশে আছে সবরের মাহাত্ম্য গাঁথা। বিশেষত কাফেরদের জুলুমের মোকাবেলায় তিনি সবরের পথ বেছে নিলেন। হযরত ইবরাহিম (আ.)- এর জীবনে অন্যতম পরীক্ষা ছিল- তাঁর নিজ সন্তানকে কুরবানী দেওয়া, শিশু সন্তানকে জনমানবহীন মরু প্রান্তরে রেখে যাওয়া। এসব কিছুর পেছনে তাঁর সবরই কাজ করেছিল। এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে হযরত ইবরাহিম (আ.) খুবই বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অধিকারী হন। কিন্তু এর আগে তিনি সবর বা ধৈর্যধারণ করেন। বিধায় তাঁর মহৎ আদর্শের ফলে আল্লাহ তাঁকে খলিল বানিয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত মুসা (আ.)-এর সবর

হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তায়া'লার দ্বীনের দাওয়াতের জন্য মিশরে আগমন করেছিলেন। কিন্তু সেই দেশের লোকেরা তাঁকে এবং আল্লাহ তায়া'লার দ্বীনকে সহ্য করতে না পেরে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। মূলত তাঁকে ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে- ফেরাউন এক আল্লাহর রাজত্ব ও ক্ষমতা ভুলে গিয়ে নিজেকে খোদা দাবি করে বসে। প্রভুত্বের দাবি করে সে মিশরের মানুষদের উপরে নানামাত্রিক জুলুম নির্যাতন করে। তাকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া এবং জুলুম নির্যাতন থেকে বিরত রাখার জন্য আল্লাহ তায়া'লা হযরত মুসা (আ.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত মুসা (আ.) ফেরাউনকে দ্বীনের দাওয়াত দিলে সে অস্বীকার

করে এবং নিজেকে মহাপ্রভু বলে দাবি করে দাম্ভিকতা প্রদর্শনে মেতে ওঠে। হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কে একটি ঘটনা কুরআনুল কারিমের সূরা আল-মুমিনুন এ এসেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

'ফেরাউন বললো, তোমরা আমাকে ছাড়ো, মুসাকে হত্যা করতে দাও। ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে। আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।' (সূরা আল-মুমিন: ২৬)

হযরত মুসা (আ.) এই সংবাদ শুনে বললেন:
وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحساب

'মুসা বললো, যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমিও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি।'
(সূরা আল-মুমিন: ২৭)

হযরত মুসা (আ.) ফেরাউনকে বারবার দাওয়াত দেওয়ার পর যখন সে এই দাওয়াতকে অস্বীকার করলো। উপরন্তু হত্যা চেষ্টায় মেতে উঠায় হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তায়া'লার নিকট আশ্রয় চেয়েছিলেন। তখন হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তায়া'লার নির্দেশে বনী ইসরাঈল গোত্রের স্বীয় অনুসারীদেরকে নিয়ে হিজরতের জন্য যাত্রা করলেন। হিজরতের জন্য রওয়ানা দিলে ফেরাউন তাদের পিছনে ধাওয়া করে। আল্লাহ তায়া'লা সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে পানির মধ্যভাগ দিয়ে রাস্তা তৈরি করে দেন।

আল্লাহ তায়া'লা তাকে আশ্রয় দান করেছিলেন এবং ফেরাউন ও তার দলবলকে নীলনদের পানিতে ডুবিয়ে শেষ করেছিলেন।

আল্লাহ তায়া'লা এ সম্পর্কেই বলেন:

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

'যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং ফিরাউন গোষ্ঠীকে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখছিলে।' (সূরা আল-বাকারা: ৫০)

এখানে একটি বিষয় হচ্ছে-ফেরাউনের নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি কোনো পদক্ষেপ নেননি বা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। যদিও ফেরাউনের কর্মকাণ্ড ছিল আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। হজরত মুসা (আ.) সবরের পথ অবলম্বন করলেন। আল্লাহ তাঁকে ফেরাউনের জুলুম থেকে মুক্ত করলেন।

হযরত নূহ (আ.)-এর সবর

হযরত নূহ (আ.) নিজের গোত্রের লোকদের নিকট ৯৫০ বছর দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। ৯৫০ বছর কাজ করার পর মুষ্টিমেয় কিছু লোক দ্বীনের দাওয়াত কবুল করে। এতো দীর্ঘসময় দ্বীনের কাজ করার পর নূহ (আ.)-এর গোত্রের লোকেরা দাওয়াত কবুল করেনি, বরং উল্টা তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছিলো। কিন্তু হযরত নূহ (আ.) সবর করলেন। তাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। যদি তারা ঈমান আনে এই আশায়।

এভাবে কেটে গেলো শত শত বছর। এরপরে নূহ (আ.) যখন দেখলেন গোত্রের লোকেরা ঈমান গ্রহণ করছে না, তখন তিনি বলে দিলেন-তোমরা ঠিক হয়ে যাও, নতুবা আল্লাহ তায়া'লা তোমাদেরকে অতিবৃষ্টি বর্ষণ করে বন্যা দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন। এই সতর্কতা দেওয়ার পর যখন হযরত নূহ (আ.) নৌকা তৈরি করতে লাগলেন, তখন তারা সবাই বললো-এতোদিন মনে করতাম পাগল, কিন্তু এখন সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হলো তিনি যে প্রকৃত পাগল। ঝড়, বৃষ্টি ও পানি না থাকা সত্বেও তিনি নৌকা তৈরি করছেন। হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের সূত্রপাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা কুরআন মাজিদে বলেন:

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّور.ُ

'শেষে যখন আমার নির্দেশ এসে গেলো, আর তন্দুর (পানিতে) উথলে উঠলো...।' (সূরা হুদ: ৪০)

মহাপ্লাবন সম্পর্কে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন:

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِر.َ

'তখন আমি আকাশের দরজাগুলো খুলে দিয়ে মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষিয়ে ছিলাম। আর জমিন থেকে উৎসারিত করেছিলাম ঝর্ণাধারা, অতঃপর (সব) পানি মিলিত হলো যে পরিমাণ (পূর্বেই) নির্ধারিত করা হয়েছিলো।' (সূরা আল-ক্বামার: ১১-১২)

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর সবর

হযরত আইয়ুব (আ.) মহান আল্লাহ তায়া'লার নবী এবং অত্যন্ত প্রিয় বান্দা ছিলেন। যে সমস্ত নবীগণ মহান আল্লাহর ওহি পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আইয়ুব (আ.) একজন। পবিত্র কুরআন মাজিদে হযরত আইয়ুব (আ.)-এর চরম দুঃখ, কষ্ট এবং ধৈর্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বর্ণনা এসেছে। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ

'এবং স্মরণ কর, আইয়ুবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরো দিয়েছিলাম। আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ।' (সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৩-৮৪)

হযরত আইয়ুব (আ.) ছিলেন রোমের অধিবাসী এবং মহান আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধর। হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইসহাক (আ.)। হযরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্রের বংশধর হযরত আইয়ুব (আ.)। হযরত আইয়ুব (আ.) যেখানে বসবাস করতেন তাওরাতে তা 'বুসরা' নামে উল্লেখ করা আছে। হযরত আইয়ুব (আ.) ছিলেন সে সময়ে বিশাল ধন সম্পদের মালিক। যাবতীয় সকল ধরনের সম্পত্তি তার কাছে ছিল।

তাঁর বিশাল পরিমাণ জমি-জমা, গৃহ-পালিত পশু এবং দাস-দাসী ছিল। সম্পদ ছাড়াও পরিবার পরিজন ও প্রচুর সন্তান নিয়ে সুখে ছিলেন তিনি। কিন্তু জীবনের সত্তর বছর বয়সে এসে মহান আল্লাহর কঠিন পরীক্ষায় একে একে তিনি সব হারাতে শুরু করেন। একে একে তাঁকে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা ছেড়ে চলে যান, কেউ তার পাশে আসেনি তাই এক পর্যায়ে শহরের বাইরে একটি আস্তাকুড়ের পাশে আইয়ুব (আ.)-কে আশ্রয় নিতে হয়। তার এই বিপদে শুধু মাত্র একজন তাকে ছেড়ে যায়নি, তিনি মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দি হযরত আইয়ুব (আ.)-এর স্ত্রী বিবি রহিমা (আ.)। তিনি হযরত আইয়ুব (আ.)-এর পাশে থেকে তার প্রতিটি কাজ করে দেন, সেবা-পরিচর্চা করেন। এভাবে তাঁকে আঠারো বছর মারাত্মক অসুখে ভোগতে হয়। এমনকি তাঁর শরীর পচে যায়। শরীর থেকে পুঁজ গড়িয়ে পড়তো এবং এখানে মশা-মাছি এসে স্থান নিতো। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য হারা হননি। ঈমানহারা হননি। আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করা বাদ দেননি। তা দেখে শয়তান খুবই হিংসা করতো। কিন্তু হযরত আইয়ুব (আ.) আল্লাহ তায়া'লার এই ঈমানী পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হযরত আইয়ুব (আ.) মহান আল্লাহর কাছে এই দুঃখ, কষ্ট থেকে মুক্তি চেয়ে দোয়া করেছেন।
দীর্ঘ সময়ে বিপদ আপদ দুঃখ, কষ্ট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও হযরত আইয়ুব (আ.) আল্লাহর ওপর ভরসা করেন। সর্বদা মহান আল্লাহকে স্মরণ করেছেন। এতটা কষ্ট ও মুসিবতে পড়েও সবসময় তিনি মহান আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন:

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) (سورة ص(44 :

'নিঃসন্দেহে আমি তাঁকে (আইয়ুবকে) ধৈর্যশীল পেয়েছি; কতো উত্তম বান্দা ছিল সে; নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।' (সূরা সোয়াদ: ৪৪)

মহান আল্লাহ তায়ালার এই কঠিন পরীক্ষায় হযরত আইয়ুব (আ.) উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর ঈমান এবং সবরের বিনিময়ে। এর পেছনে আছে মহান আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর ভালোবাসা। তিনি আল্লাহর কাছে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরিত্রাণ না পাচ্ছেন ততক্ষণ সিজদাহ না ছাড়ার নিয়ত করেন। এখানেও তাঁর সবরের পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং সুস্থ করে দিয়ে তাঁর সহায়- সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি পুনরায় ফিরে পান।

খুবাইব রাদিআল্লাহু আনহুর সবর

খুবাইব (রা.) কে শহিদ করার ঘটনাটি ছিলো খুবই নির্মম।খুবাইব (রা.) কে এক যুদ্ধে বন্দি করে এনেছিলো কাফিররা। অনেকদিন তাদের কাছে বন্দি থাকার পরে তারা তাকে হত্যা করার মনস্থ করলো। কিন্তু এইসব কাফেররা তাকে অনেক কষ্ট দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে হত্যা করেছে। একদিন হত্যার জন্য তাকে উন্মুক্ত মাঠে নিয়ে আসা হলো।
তখন জাহান্নামের কীটগুলো হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে উপহাস করছিলো।

হযরত খুবাইব (রা.) কে শিকলে বেঁধে হাজির করা হয়েছে। উন্মুক্ত খোলা মাঠ; অজস্র তীরন্দাজ ধনুকে তীর গেঁথে দাঁড়িয়েছিলো চর্তুদিকে। শূল প্রস্তুত; আনন্দে মেতে উঠেছিলো কাফিররা। ঘটনাস্থলে হাজার মানুষের ভীড়। খুবাইব (রা.)র কোন ভয় নেই। ইসলামের জন্য নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করতে পেরে তিনি আনন্দিত।

প্রথমে খুবাইবের অঙ্গ-প্রতঙ্গ একেক করে কাটা হবে। তারপর শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়ালেন খুবাইব (রা.)। কাফিরদের কাছে কিছু সময় চাইলেন, জীবনের এই শেষ মূহুর্তে পরম প্রভুর সমীপে অবনত মস্তক নিবেদন করার জন্য। প্রেম নিবেদন করবেন প্রেমময় প্রভুর সাথে। হতভম্ব হয়ে গেলো কাফিররা। খুবাইব (রা.) ইসলামের জন্য জীবন দান করবেন বলে মহা খুশী। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েননি। অনুমতি দিলেন কাফিররা; মাত্র দু'রাকাত সালাত। আর বেশী সময় নয়। কাফিররা ধমকের সুরে বললো- "যাও, তোমার আল্লাহ-র সাথে কথা বলো।"
সালাতে দাঁড়ালেন তিনি। অনুমতি নেয়া সময়টুকুকে নিবেদন করলেন প্রভুর নিকট। মনে খুশির ঢেউ। সালাত শেষ করার পর কাফিরদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রোহী কণ্ঠে বললেন-

"আমি দু'রাকাতের চেয়েও আরো বেশী সময় নিতাম কিন্তু নেইনি। কারণ তোমরা মনে করতে পারো আমি মৃত্যুকে ভয় করি। আমি কখনো এই নির্মম মৃত্যুকেও ভয় করি না।"

এরপর তাঁদের দিকে শক্ত কণ্ঠে কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। তাঁর সেই কবিতা সাহসি, কালজয়ী। জানি সে কবিতার আসল উদ্দেশ্য অনূদিত ভাষায় কখনই বুঝানো যাবে না। তবুও....

নেই কোন পরওয়া আমার,
আমিতো কেবল মুসলমান।

হাজানেই কোন পরওয়া আমার,
আমিতো কেবল মুসলমান।

হাজারো কষ্ট হোক না আমার,
এ জীবনতো প্রেমময়ের জন্যই দান।

যদি চায় আমার প্রেমময় প্রভু, প্রত্যেক কর্তিত অঙ্গে করবে বরকত দান।
(সহিহ বুখারী :৩৯৮৯)

আর দেরী নয়, শুরু হলো খুবাইব (রা.)র উপর ইতিহাসের নিষ্ঠুর নির্মম নির্যাতন। একেক করে কাটা হচ্ছে খুবাইবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। রক্তের ঝর্ণা যেন শত ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলছে। তবুও তিনি স্থির, অবিচল ছিলেন ইস্পাত লোহার মতো। তারপর শুরু হলো তীর নিক্ষেপ। চতুর্দিকের তীরন্দাজের নিক্ষিপ্ত তীর ঝাঁকে-ঝাঁকে আসতে লাগলো। বৃষ্টির মতো বিদ্ধ হতে

লাগলো তার স্বচ্ছ গায়ে। আহ! কী নিষ্ঠুরতা! আসলে এরাতো আদতে কোন মানুষ নয়। বাস্তবে পশু। তাই এরকম পশুর মত আচরণ তাদের দ্বারাই সম্ভব।

কারণ ঈমানের আলো দ্বারা আলোকিত নয় এই পশুগুলোর হৃদয়। তাদের নির্মম, বর্বর আচরণ দেখে নিরবে কাঁদলো আকাশ। থমকে দাঁড়ালো বাতাস।

খুবাইব (রা.) আকাশের দিকে তাকান, বিনীতসুরে ফরিয়াদ জানান রবের কাছে হে আল্লাহ! এখানের সবাই আমার শত্রু। কেউ আমার আপন নয়, বন্ধু নয়, প্রিয় নয়। আমার শেষ সালামটুকু আপনার প্রিয় বন্ধু প্রিয়নবি রাসুল-কে পৌঁছে দিন।

ধীরে-ধীরে ঢলে পড়লেন খুবাইব। নিস্তেজ হয়ে গেলো তাঁর দেহ। এখানেই ক্ষান্ত নয়। পাষণ্ড, হৃদয়হীনরা তাঁর কর্তিত লাশকে শূলে ঝুলিয়ে রাখলো। আর নামালো না। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও মদিনায়। বসে আছেন আলোর আসরে।সাহাবায়ে কেরাম-কে সামনে নিয়ে। ওহি আসলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন-হে আল্লাহর রাসুল! পিয়ারা হাবিব। আপনার প্রিয় সাহাবা খুবাইব শহিদ হয়েছেন এবং তাঁর সাথে আরো কয়েকজন। তাঁকে শূলে চড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, শহিদ হওয়ার সময় খুবাইব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। রাসুল তাঁর সালামের উত্তর দিলেন।
পুরো ঘটনা খুলে বললেন সাহাবায়ে কেরামকে। কষ্টে হাহাকার করে উঠলো রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এর বুক। দুঃখের পতাকা পতপত করে উড়তে লাগলো তার হৃদয়াকাশে। কেঁদে উঠলো তার অন্তর। দুঃখে রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের বুকের জমিন চৌচির হলো। তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। কান্নার ঢেউ প্রবাহিত হতে লাগলো তাঁদের গাল বেয়ে। কষ্টে তাদের ভেতরটা ভেঙ্গে যায়। চূর্ণ- বিচূর্ণ হয়ে যায়। কষ্টের টুকরোগুলো এক-এক করে জমা হতে থাকে তাদের হৃদয়ে। কষ্টের ঝড়ে হৃদয়ে প্লাবন তোলে। দু'চোখে বয়ে চললো অশ্রুনদী। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শান্তনা দিলেন। কখনো ভেবে দেখেছেন বড়দের ধৈর্যধারণের ব্যাপারে।

আহমাদ বিন হাম্বল (রহি.)-এর সবর

সালাফদের একজন ব্যক্তি হলো আহমাদ বিন হাম্বল (রহি)। খলিফা মামুন প্রথমে মহাম্মাদ বিন নুহ (রহি.) কে বন্দি করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তাকে বন্দি করে খলিফার দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহি.) কে অসিয়ত করে গেলেন, যেন তিনি খলকে কুরআনের মাসাআলার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেন।

এরপর মুহাম্মাদ বিন নুহ (রহি.) রাস্তাতেই এ ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানার সমস্ত লেনদেন চুকিয়ে পাড়ি জমান পরপারে।

এবার ইমাম আহমাদের পালা। খলকে কুরআনের মাসালায় খলিফার মতের বিপরীত হওয়ার কারণে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল-কে হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসা হলো খলিফার দরবারে। লোকেরা ইমাম আহমাদকে খলকে কুরআনের ব্যাপারে ফতোয়া পরিবর্তন করতে বললেন, কিন্তু আহমাদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি খাব্বার রাদিআল্লাহু আনহুর ধৈর্য সম্পর্কে জানো না?

হযরত খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহু একদা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললো-হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কষ্ট ও দুঃখের ব্যাপারে আপনি আল্লাহ তায়া'লার কাছে দোয়া করুন; যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। এ কথার উত্তরে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের কথা কি ভুলে গেছো? তোমাদের পূর্বে এমন লোক অতিবাহিত হয়েছে; যাদেরকে জমিনে কূপ খনন করে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে, অতঃপর তাকে এনে করাত দিয়ে তার মাথাকে দু'খন্ড করা হয়েছে। তবুও তাকে দ্বীন থেকে ফেরাতে পারেনি। এমনিভাবে লোহার চিরুনী দিয়ে তার শরীরের গোস্তকে আঁচড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবুও সে ব্যক্তি ইমানের উপর অটল ছিলো। কোন নির্যাতনই তাকে দ্বীন থেকে ফিরাতে পারেনি। "(সহিহ বুখারি :৩৬১২)

সে কষ্টকে সহ্য করে তাতে ধৈর্যধারণ করেছে। ইমাম আহমদের এরকম জ্বলন্ত বক্তব্য শুনে লোকেরা তাকে নসিহত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে চলে গেলেন।

ইমাম আহমাদ (রহি.)আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে বলেছিলো, “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে খলিফা মামুনের চেহারা দেখাবেন না।"

আল্লাহ তায়া'লা তার দু'আকে কবুল করে নিয়েছেন। ব্যস, সাথে-সাথেই খলিফা মামুন এই লোভাতুর দুনিয়া ত্যাগ করলেন, সে আর ইমাম আহমাদ (রহি.)কে চেহারা দেখাতে পারেনি। তারপরের খলিফা নিযুক্ত হলো। লোকেরা আহমাদ (রহি.) কে উদ্দেশ্য করে উপদেশ দিচ্ছিলো- মুহতারাম। খলকে কুরআন তথা "কুরআন সৃষ্ট" এরকম ফতোয়া প্রদান করে এই জালেম বাদশাহ থেকে মুক্তি পেয়ে যান। আপনি তো জানেন এ বাদশাহ খুব খারাপ মানুষ। আপনাকে সে তলোয়ারের মাধ্যমে হত্যা করবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহি.) এর বুকে ছিলো ইমানের হিমালয়। তিনি একদম শক্ত ছিলেন, হৃদয়ে গেঁথেছেন ধৈর্যের খুঁটি। তিনি লোকদের কোনো কথাই শুনলেন না।

একদিন খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করলো- 'বেটা! তুমি বোধ হয় আমাকে ভালো করে চিনতে পেরেছো? আমি কিন্তু সালেহ আর রশিদকে হত্যা করেছি। সে আমার অনুগামী ছিলো না। এই খলকে কুরআনের মাসআলার ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সে এর উল্টো জবাব দিয়েছিলেন, তাই তাকে হত্যা করেছি। এবার তাহলে বলো খলকে কুরআনের মাসআলায় তোমার মতামত কি? ইমাম আহমাদ বললেন, আমি কুরআনকে "মাখলুক বা সৃষ্ট" বলবো না। অতঃপর শুরু হলো নির্দয় আচরণ। জল্লাদ চাবুকের আঘাতে আহমাদ (রহি.) কে রঞ্জিত করতে লাগলো। কিল, ঘুষি, লাথি যে যেমন পারছে দিচ্ছে। তারপর সব জল্লাদরা তাকে তিরস্কার করতে লাগলো। ওরা মারতে মারতে ক্লান্ত আর আহমাদ (রহি.) ধৈর্যধারণ করে যাচ্ছেন অবিরত। কী নির্মম দৃশ্য। সহ্য করার মত না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহি.) হয়ে পড়লেন জীবন্ত মরা লাশ।

খলিফা ইমাম আহমাদ (রহি.) কে বললো, তুমি নিজেকে হত্যা করে ফেলে দিয়ো না। তুমি শুধু বলো যে, কুরআনুল কারিম "সৃষ্ট" তাহলে তোমাকে এ কষ্ট থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। অতঃপর একজন জল্লাদ তলোয়ার নিয়ে আহমাদ (রহি.) এর মাথার কাছে গিয়ে বললো-হে আহমাদ। তুমি ধ্বংস হও। তুমি এমন জবাব দাও, যাতে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু না, তিনি খলকে কুরআনের মাসায়ালায় ছিলেন ইস্পাত লোহার মতো শক্ত। তিনি উত্তরে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন। তাহলে আপনার মতের স্বপক্ষে কেবল একটা দলিল দেখান। তাহলে আমি সব মেনে নিব। এরপরই এক জল্লাদ আবারো মারতে শুরু করলো। চামচাদের থেকে একজন বলে উঠলো,তার চেহারাকে উল্টো করে রাখো ও শরীরকে মাটিতে বিছিয়ে দাও, আমরা পদদলিত করবো। তবুও ইমাম আহমাদ (রহি.) বলেন, না, আমার কোন ভয় নেই। অতঃপর ইমাম আহমাদ (রহি.) অনেক কাল কারাগারে বন্দি ছিলেন। প্রায় আটাশ মাস পর্যন্ত বন্দি ছিলেন।

সালাফদের একজন বলেছিলেন, ইমাম আহমাদ (রহি.) নিজের জীবনকে দ্বীনের রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যেমন বেলাল হাবশি রাদিআল্লাহু আনহু নিজের জীবনকে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেছেন। যদি ইমাম আহমাদ (রহি.) না হতো তাহলে দ্বীন চলে যেত।
হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/১৭১-২০৩।

প্রিয় বন্ধু' তুমি যদি বড়দের ধৈর্যধারণের কথা একটু স্মরণ করতে পারো, তাহলে তোমার জন্য ধৈর্যধারণ করা সহজ হবে। সুতরাং তুমি যদি ধৈর্যধারণ করে দ্বীনের পথে হাঁটতে পারো, তাহলে তুমি সফলতা পাবেই ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তায়া'লা তোমাকে মদদ করুন। আমিন।

সবর বাড়ানোর উপায়

মুসলমানদের আশার আলো এবং চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হলো এই জান্নাত। কোনো মুসলমানের অন্তরে যদি এই জান্নাতের প্রতি লোভ-লালসা তৈরি হয়ে যায়। তবে সে যেকোনো বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করতে পারবে। এছাড়া ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে মুমিনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, যেকোনো বিপদে-আপদে সে কারো কাছে হাত পাতে না। বরং তার আত্মসম্মান সৃষ্টি হয়। সবরকারী হতে হলে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের ভয় করা
দুনিয়াকে ছেড়ে চলে যেতে হবে একদিন। মহান মনিবের দরবারে হাজির হতে হবে। তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের। তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে হলে তাঁরই পথে চলতে হবে। এজন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। যদি তাঁর কুদরত ও শাস্তিকে ভয় করা সম্ভব হয়, তবে দ্বীনি কাজ আঞ্জাম দিতে অবশ্যই ধৈর্যের সৃষ্টি হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেন, তোমরা যারা আল্লাহ তায়া'লার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখো, তাদের উচিত দেরি না করে আল্লাহ তায়া'লার দ্বীনের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করা। কারণ, কারো জানা নেই কার মৃত্যু কখন আসবে?

আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
'এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল, এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা মহা ভাগ্যবান।' (সূরা ফুসসিলাত: ৩৫)

অর্থাৎ, সে যদি চিন্তা করে মৃত্যুর কোনো নিশ্চয়তা নেই, হঠাৎ করে সেও মারা যেতে পারে। এজন্য দ্বীনের প্রতি চলা কর্তব্য। এ অনুভূতি দ্বীনের পথে চলতে তাঁকে ধৈর্যধারণকারী হিসেবে গড়ে তুলবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে (সে জেনে রাখুক যে) আল্লাহর নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে, তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।' (সূরা আল-আনকাবুত: ০৫)

২. শাহাদাতের তামান্না লালন করা

কেউ যদি আল্লাহ তায়া'লার রাস্তায় জিহাদ করে, তাহলে তার নিজের জন্য কল্যাণ রয়েছে। কেউ যদি জিহাদ না করে, তাহলে এতে আল্লাহ তায়া'লার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে কোনো বান্দা যদি হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না লালন করে তবে তার পক্ষে জিহাদের কাজ করা অসম্ভব কিছু নয়। আর এ কাজ করতে গিয়ে ধৈর্যধারণ করাও একেবারে সহজ হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

'যে লোক (আল্লাহর পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, সে তার নিজের কল্যাণেই প্রচেষ্টা চালায়, আল্লাহ সৃষ্টিজগত থেকে অবশ্যই বে-পরওয়া।'
(সূরা আল-আনকাবুত: ০৬)

আল্লাহ তায়া'লার দ্বীনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং কাজ করার দ্বারা নিজের ব্যক্তি জীবনে উপকৃত হওয়া যাবে। এতে আল্লাহ তায়া'লার কোনো লাভ ক্ষতি হবে না। যা হবে তা নিজের জন্য হবে। আমরা কেউ যদি দ্বীনের কাজ না করি, তাহলে আল্লাহ তায়া'লার দ্বীনের কাজ আটকে থাকবে না। আমরা যা করবো, তাতে আমাদের ফায়দা হবে। এর সঙ্গে যদি ধৈর্যের সংমিশ্রণ ঘটে, তবে ফায়দা আরো দ্বিগুণ হবে। এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে জিহাদ কি? এ সম্পর্কে অবগত না হলে বিভ্রান্তির শিকার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শাব্দিক অর্থে জিহাদ বা মুজাহাদা শব্দের অর্থ হলো-বিপরীত শক্তির সাথে সংগ্রাম করা। ইসলামের কাজ করতে চাইলে তখন একটি শক্তি বাধা দিবে, সেই শক্তির সাথে সংগ্রাম করার নাম জিহাদ। আর একেবারে সহজ অর্থে যদি বলি তবে এটাই দাঁড়ায়-দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার যত ধরনের প্রচেষ্টা করা হয়, তার সবকিছুই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। আর প্রথমত আল্লাহ তায়া'লার ইবাদত করতে গিয়ে আমাদেরকে সবসময় জিহাদ করতে হবে। আর এই জিহাদ হতে হবে শয়তানের

বিরুদ্ধে। কারণ শয়তান সদা-সর্বদা আমাদের পিছনে লেগে থাকে। যার জন্য আমাদেরকে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে জিহাদ করতে হবে নিজের নফসের বিরুদ্ধে। কেননা নফস সবসময় ভালো কাজ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। এর পরে আমাদেরকে সমাজের রীতিনীতি ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। আর এই জিহাদ চলমান থাকতে হবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। তবে মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ করতে হলে মনের মধ্যে সেই চেতনাকেই লালন করতে হবে। অর্থাৎ, জিহাদ তথা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে গিয়ে কাফির শক্তির জুলুম নির্যাতনের শিকার হওয়া স্বাভাবিক। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সবর এখতিয়ার করতে হবে। আর বান্দার অন্তরে যদি শাহাদাতের তীব্র আকর্ষণ এবং প্রেষণা থাকে তবে তার পক্ষে সবরকারী হওয়া একেবারে সম্ভব।

৩. সত্যিকার ঈমান আনা

সত্যিকার ঈমান আনলে মানুষ যেকোনো বিপদ-আপদেও বিমর্ষ হয় না। চিন্তিত হয় না। বরং এক আল্লাহর ওপর ভরসা করে। ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর সাহায্য চায়। এটাই মুমিনের সিফত। যারা ঈমান আনে এবং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করে তাঁদের জন্য রয়েছে অপরিসীম পুরস্কার। অর্থাৎ, যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, আল্লাহ তায়া'লা তাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে অতি উত্তম প্রতিদান দান করবেন।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) (سورة العنكبوت(07 :

'আর যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলোকে মুছে দেবো, আর তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই প্রতিদান দেবো তাদের উৎকৃষ্ট কাজগুলোর অনুপাতে যা তারা করতো।' (সূরা আল-আনকাবুত: ০৭)

অর্থাৎ, ঈমান গঠনের পথে ধৈর্য অন্যতম এক নিয়ামক শক্তি। তাই সত্যিকার ঈমান গঠনই হতে পারে ধৈর্য গঠনের অপরিহার্য প্রধান অঙ্গ।

৪. নেক আমলে জুড়ে থাকা

শুধুমাত্র ঈমান থাকলে হবে না। এর সঙ্গে নেক আমল থাকতে হবে। ঈমান ছাড়া যেমন নেক আমলের কোনো গুরুত্ব নেই। তেমনই নেক আমল ছাড়া ঈমানের কোনো গুরুত্ব নেই। আর

নেক আমল করতে গেলে ধৈর্যের প্রয়োজন। আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ধৈর্যধারণকারী হওয়া সম্ভব।

আর নেক আমলের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

'যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, তার জন্য রয়েছে সেই আমলের অনুরূপ দশগুণ।' (সূরা আল-আনআম: ১৬০)

আবার অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

'যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবো।' (সূরা আল-আনকাবুত : ০৯)

৫. গুনাহ ত্যাগ করা

মুমিন ব্যক্তির বারবার গোনাহের কাজ করা উচিত নয়। এতে আল্লাহ তায়া'লা নারাজ হন। আল্লাহ তায়া'লা চান তাঁর বান্দা যেন গুনাহ না করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে ক্ষমা করতে পারে? আর জেনে শুনে নিজেদের পাপে বাড়াবাড়ি করে না।' (সূরা আলে-ইমরান: ১৩৫)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً

'যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে, তারপর আল্লাহর কাছে তাওবা করে, সে আল্লাহকে ক্ষামাশীল দয়ালু পাবে।' (সূরা আন-নিসা: ১১০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'বলো-হে আমার বান্দাগণ। যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তামাম গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।'
(সুরা আয-যুমার: ৫৩)

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন:

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

'তোমরা স্বীয় প্রভুর কাছে ইস্তেগফার করো অতঃপর তাঁর কাছে তাওবা করো। নিশ্চয় আমার প্রভু দয়ালু, প্রেমময়।' (সুরা হুদ: ৯০)

হাদীসের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ তায়া'লা মহব্বত বা ভালোবাসাকে ১০০ ভাগ করে ৯৯ ভাগ নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন। আর বাকি এক ভাগ সৃষ্টিকুলের জন্য দিয়েছেন। এই একভাগ থেকে মানুষ তার আপনজন সবাইকে মহব্বত করে থাকে। আমরা এক ভাগের একাংশের মালিক হয়েও একে অন্যের জন্য কতই-না মহব্বত! আর যে আল্লাহ তায়া'লা ৯৯ ভাগের অধিকারী তাঁর মহব্বত কতটুকু হতে পারে তা চিন্তা করে শেষ করার মতো নয়। আল্লাহ তায়া'লার এই মহব্বতের কারণে আমাদের তথা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য কুরআনুল কারিম নাজিল করেছেন। যাতে করে মানুষ কুরআনুল কারিম থেকে সুপথ প্রাপ্ত হয়ে জান্নাতবাসী হতে পারে। কিন্তু আমাদের এই কুরআনুল কারিমের সাথে সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসেন। যার কারণে আমরা অনেক গুনাহ করার পরেও আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। সকল মানুষ কিছু না কিছু গোনাহগার। একমাত্র নবী-রাসুলগণ মাসুম বা নিষ্পাপ। আমাদের অনেকে মনে করেন, আল্লাহ তায়া'লা ক্ষমাশীল ও প্রেমময়। সুতরাং আমরা বেশি বেশি গোনাহ করলেও অসুবিধা নেই,আল্লাহ তায়া'লা ক্ষমা করে দিবেন। আর কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহ তায়া'লা অত্যন্ত কঠোর। যার কারণে তারা সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা এককভাবে কোনোটি নন, বরং উভয়টির সমন্বয়ে আল্লাহ তায়া'লা। তবে বান্দা হিসেবে আমাদেরকে গুনাহ ত্যাগ করা উচিত।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

'আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। আর আমার শাস্তি তা বড়ই ভয়াবহ শাস্তি।' (সূরা আল-হিজর: ৪৯-৫০)

অর্থাৎ, বান্দা যদি তাঁর রবের অনুগ্রহ চিন্তা করে, তবে তার পক্ষে দ্বীনকে মেনে চলা একেবারে সহজ। বিশেষত, এর মাধ্যমে সে গুনাহকে ত্যাগ করার প্রশস্ত পথ খোঁজে পাবে। আর গুনাহকে ত্যাগ করতে অবশ্যই ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাই বলা যায়, গুনাহ থেকে বিরত রাখার সামগ্রিক প্রচেষ্টাই হতে পারে ধৈর্যধারণকারী হওয়ার অনন্য একটি উপায়।

উপসংহার

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দিয়েছেন যখন আমরা কষ্টে নিপতিত হই। আবি সালাবা খুশানী (রা.) বলেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "তোমাদের সামনে সবরের দিন আসবে। সেই দিনগুলোতে ধৈর্যধারণ করা হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের উপর পা রাখার মতো। সে সব ফিতনায় ধৈর্যধারণকারীর আমল তোমাদের পঞ্চাশজন ব্যক্তির আমলের সমান হবে।"(যে ব্যক্তি ঐসব ফিতনায় ধৈর্যধারণ করবে, সে ফিতনাহীন ব্যক্তির দশগুণ সওয়াব পাবে)।
(সুনানু আবু দাউদ: ৪৩৪১)

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত হাদিসে বলেছেন, তোমাদের মাঝে এমন দিন আসবে সেদিন কেবল ধৈর্যধারণকারীরা আল্লাহ-র কাছে প্রিয় হবে। আর যে ঐ দিনগুলিতে ধৈর্যধারণ করবে, তার নাম হবে "ধৈর্যধারণকারী"। সুতরাং তোমার জীবন নদীতে কষ্ট আসলে তুমি ধৈর্যধারণ করবে।

কবি আবৃত্তি করেছেন-
বুকে যত দুঃখ-কষ্ট আসুক করিও সবর,
পাবে তুমি এর প্রতিদান হবে জান্নাতে ফসল।

যুগে-যুগে যত মনিষী ধৈর্য সাধনা করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে জাতি-সভ্যতার উপরে।
(নাশরুতি আত তারিফ: ৮৭)
আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা এ বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিতেন। আগত সকল প্রজন্মকে তারা বিপদের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করতেন। হুযাইফা (রা.) বলেন, তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, কেননা অচিরেই তোমাদের বিভিন্ন মুসিবতে পড়তে হবে।
শুআবুল ইমান: ৯৭২০। আস সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান: ১৭

পূর্বেকার বুযুর্গরা মৃত্যুর সময় তাদের সন্তানাদিকে ধৈর্যধারণের অসিয়ত করে যেতেন। লোকমান হাকিম তার সন্তানকে দ্বীনের পথে হাজারো বাঁধা আসলে তাতে ধৈর্যধারণের অসিয়ত করে গেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
"হে প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। "
সুরা লোকমান : ১৭

আজকাল আমাদের অবস্থা খুবই কঠিন। শত্রুরা চারদিক থেকে ওঁৎ পেতে আছে। ঈমান ও তাকওয়া দুর্বল হয়ে পড়ছে। এখন শোনা যায় মাজলুমের কান্না। প্রকৃতিকে ভারী করে নির্যাতিত মায়ের করুণ আর্তনাদ। চারদিকে পাপ আর পাপ। মুনাফিকিতে ভরে গেছে পুরো পৃথিবি। এখন আমাদের ধৈর্যধারণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে আল্লাহ সুবনাহু ওয়াতালার আনুগত্যের ওপর। ধৈর্যধারণ করতে হবে সব পতিত কষ্টের ওপর।

গুনাহ না করে তাতে ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ জাহান্নামের আগুনের ওপর ধৈর্যধারণ করা থেকে। আখেরাতের ময়দানে জাহান্নামের শিকলে বন্দী হওয়ার থেকে দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ-র আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ। কতই না উত্তম ধৈর্যধারণের স্থান। আর কতই না উত্তম চরিত্র ধৈর্যধারণের চরিত্র। আসুন আমরা সবাই জীবনের প্রতিটি ক্ষণে-ক্ষণে হাজারো কষ্ট আসলেও তাতে ধৈর্যধারণ করে জান্নাতের পথ সুগম করি। সবশেষে রবের দরবারে হাত তুলে বলি-

হে প্রিয়তম প্রভু! আপনি আমাদের জন্য সবরের রাস্তা খুলে দিন।
হে প্রেমময় প্রভু! আপনি আমাদেরকে তাদের দলে অর্ন্তভুক্ত করে দিন, যারা কষ্টের অকূল দরিয়ায় পতিত হয়েও তাতে ধৈর্যধারণ করেছে।
হে আমাদের রব! আমাদের এমন ব্যক্তিদের কাতারে প্রবেশ করিয়ে দিন যারা সঠিক পথ পেয়েছে, যাদের জন্য সোজা রাস্তা সুস্পষ্ট রয়েছে।

ওগো আল্লাহ! আপনি আমাদের এমন ব্যক্তিদের কাতারে পথ প্রদর্শন করুন যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে ধৈর্যধারণ করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

ধৈর্য হারাবেন না - শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ।
সবর - ইবনুল কায়্যিম আল -জাওযিয়্যা
সবর বা ধৈর্য - প্রিন্সিপাল মাওলানা শরীফ আব্দুল কাদির
সবর ও শোকর - ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)
সফলতার চাবিকাঠি (ইয়াকীন ও সবর) - শাইখ মূসা জিবরীল

তথ্যসূত্র

https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/

https://www.jaijaidinbd.com/todays-paper/first-page/347643

https://banglanews24.com/islam/news/bd/1373131.details

https://www.somoynews.tv/news/2023-07-05/W72sSP93

https://www.jagonews24.com/religion/islam/725324

https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/prophet-life/156428

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=57&chapter=8398

https://m.dailyinqilab.com/article/105464